

Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.3
Pages	125-140
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আলবেরুনীর ভারত-তত্ত্ব

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্

॥ এক ॥

[হিন্দুদের যে-সব বিদ্যা অজ্ঞতার দিগন্তে পক্ষবিস্তার করে]

ভোজবাজি বা চাতুরির দ্বারা কোনও বস্তুর প্রকৃত রূপকে অন্য রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে উপস্থিত করার নাম ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা। এই অর্থে যাদুবিদ্যা মানব সমাজে বহুল প্রচলিত। জনসাধারণ অবশ্য যাদু অর্থে অসম্ভবকে সম্ভব করানোই বোঝে। সে অর্থে নিলে বলতে হয় যে যাদুর কোনও অস্তিত্ব নাই। কারণ যা অসম্ভব, তা সম্ভব হতে পারে না, এবং সেজন্য ওটি নিছক ধাপ্পা বই আর কিছুই হতে পারে না। এই বিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সংস্রবই থাকতে পারে না।

এই যাদুরই একটি প্রকার হচ্ছে "কিমিয়া" (Alchemy)। 'কিমিয়াকে' অবশ্য কেউ যাদু বলে না, কিন্তু কেউ যদি একটু তুলা নিয়ে সোনার মত করে দেখায়, তাকে যাদু ছাড়া আর কি নামে অভিহিত করা যাবে? রূপাকে সোনার মত করে দেখানোর সাথে কেবল গিল্টি করার সুবিদিত প্রক্রিয়া ছাড়া এর কোনও তফাৎ নাই।

হিন্দুরা অবশ্য 'কিমিয়া'তে তেমন একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে না, কিন্তু কোন জাতিই এর মোহ থেকে মুক্ত নয়। কোনও কোনও জাতি আবার অন্যের তুলনায় এর প্রতি বেশী মনোযোগী। তার থেকে অবশ্য কোনও জাতির বুদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ হয় না, কারণ অনেক বুদ্ধিমান লোককেও কিমিয়া নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে, আবার অনেক মূর্খ ব্যক্তিকে এ বিদ্যা

ও তার চর্চাকারীকে উপহাস করতে দেখা গেছে। কিমিয়া নিয়ে সময় ক্ষেপণ করে বলে এসব বুদ্ধিমানদের অবশ্য নিন্দা করা যায় না, কারণ সৌভাগ্য অর্জন ও দুর্ভাগ্য এড়ানোর ঐকান্তিক লোভই তা'দিকে প্রলুব্ধ করে। এক ব্যক্তি একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করেছিল, "পণ্ডিতরা ধনীদের দ্বারে কেন ভীড় করে? ধনীরা ত' কখনও পণ্ডিতদের দ্বারে যায় না?" দার্শনিক বলেছিল, "তার কারণ, পণ্ডিতরা ধনের মূল্য বোঝে, কিন্তু ধনীরা জ্ঞানের মাহাত্ম্য বোঝে না।" তেমনি কিমিয়াকে যারা পরিহার করে এবং সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না, তাদের বুদ্ধির তেমন প্রশংসা করা যায় না, কারণ তাদের আচরণের মূলে আছে জড়বুদ্ধি ও মূর্খতা, যা আসলে দূষনীয়।

যারা কিমিয়া চর্চা করে তারা একে গোপন রাখতে চেষ্টা করে, এবং অন্য যারা এ বিদ্যা চর্চা করে তাদের সাথে মেলামেশাও করতে চায় না। এইজন্য, হিন্দুরা কিমিয়া চর্চায় কোন্ পদ্ধতির অনুসরণ করে তা জানার সুযোগ আমার তেমন হয়নি। তবে ওদিকে আমি ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) ভস্মীকরণ (calcination) বিশ্লেষণ (analysis) ও অভ্রের দ্রবণ (যাকে ওরা 'তালক' বলে) পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে শুনেছি। তার থেকে অনুমান করি, যে ওরা 'খনিজ' প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী।

'কিমিয়া'রই মত হিন্দুদের নিজস্ব আর একটি বিদ্যা আছে, যার নাম 'রসায়ন'।

পদটি 'রস' অর্থাৎ 'স্বর্ণ' থেকে উদ্ভূত। কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, ওষধি প্রয়োগ ও মিশ্রণ করার বিদ্যাকে রসায়ন বলে। ঔষধগুলির বেশীর ভাগই উদ্ভিজ বা বনজ। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে হতাশ্বাস রোগীর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে নবীন যুবার তেজ ও ক্ষমতাদান, যাতে কেশ পুনরায় চিকন কৃষ্ণ হয়, ইন্দ্রিয়সমূহ সবল হয় এবং যৌবনোচিত স্ফূর্তি ও স্ত্রীসম্ভোগের ক্ষমতা জন্মায় ও মানুষের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়। আর কেনই বা হবে না? আমরা পাতঞ্জলীর মত উদ্ধৃত করে আগেই বলেছি যে, মোক্ষলাভের এক পদ্ধতি হচ্ছে রসায়ন। কে এমন আছে, যে একথায় বিশ্বাস করে আনন্দে উল্লসিত হবে না, আর এ শাস্ত্রের গুরুর মুখে উত্তম খাদ্য তুলে দেবে না?

রাসায়নিকদের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন নাগার্জুন, সোমনাথের নিকটস্থ 'দিহক' (Dihak) দুর্গের অধিবাসী। এ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

তিনি একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন, যাতে রসায়নের যাবতীয় গ্রন্থের সার সঙ্কলন করা হয়েছিল। পুস্তকটি এখন দুষ্প্রাপ্য। নাগার্জুনের জীবৎকাল আমাদের সময় থেকে প্রায় একশত বৎসর।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে (তাঁর সময়কাল আমরা পরে উল্লেখ করব) উজ্জয়িনী নগরে 'ব্যাদি' নামে একটি লোক ছিল। লোকটি রসায়ন চর্চায় তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছিল এবং তাতে ধন ও জীবন দুই-ই নষ্ট করেছিল। এত চেষ্টা করেও কিন্তু সে রসায়ন দ্বারা সহজে প্রস্তুত হতে পারে এমন বস্তুও পেল না। তার ধন-সম্পত্তি নিঃশেষ-প্রায় হয়ে এলে এই শাস্ত্রের প্রতি তার অশ্রদ্ধা জন্মালো। অবশেষে মনোবেদনায় ও হতাশায় একদিন এক নদীর তীরে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলো। তার হাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহের একটি পুস্তক ছিল, যার থেকে মিশ্রণ করার জন্য সে ঔষধাদি নির্বাচন করত। মনের খেদে সে ঐ পুস্তকের পাতাগুলি একটি একটি করে ছিঁড়ে জলে ফেলতে লাগল। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে নদীর তীরে একটু নীচের দিকে একটি গণিকা বসেছিল যার সম্মুখ দিয়ে ছেঁড়া পাতা-গুলি ভেসে যাচ্ছিল। গণিকাটি এই পাতাগুলি তুলে নিয়ে বুঝতে পারল যে সেগুলি রসায়ন সংক্রান্ত। শেষ পাতাটি জলে ভাসান পর্যন্ত লোকটি তাকে দেখতে পায়নি। গণিকাটি তখন তার কাছে এসে পুস্তকটিকে এভাবে নষ্ট করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে লোকটি বললে, "আমি এর থেকে কোনও উপকার পাইনি, যে সমস্ত বস্তু আমার পাওয়া উচিত ছিল তাও আমি পাইনি। অথচ এই শাস্ত্রের অনুশীলনে আমার সমস্ত ঐশ্বর্য নষ্ট করে আমি কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি।" গণিকা তখন বললে, "যে সাধনায় তুমি জীবনপাত করেছ তাকে ছেড়ো না, তোমার পূর্বে মনীষীরা যার সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন, তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ো না। এমনও হতে পারে, যে তোমার ও তোমার লক্ষ্যের মধ্যে যে বাধা দেখেছ, তা আকস্মিক, এবং আকস্মিক ভাবেই সে বাধা দূর হবে। আমার অনেক ধন আছে, এ সবই তুমি তোমার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যয় করতে পার।" একথা শুনে লোকটি পুনরায় রসায়নের অনুশীলন করতে লাগল।

রসায়নের পুস্তকগুলি সাংকেতিক ভাষায় লেখা থাকে। সেজন্য লোকটি ব্যবস্থা পত্রে উল্লিখিত একটি প্রয়োজনীয় ঔষধের নাম ভুল পড়েছিল। ঔষধটি তেল ও মানব রক্তের সংমিশ্রণ। ব্যবস্থাপত্রে লেখা ছিল, "রক্তামল," লোকটি তার অর্থ করেছিল 'লাল আমলকি'। কাজেই সে ঔষধে কোন ফল হয়নি।

তার ধারণামত ঔষধগুলি প্রস্তুত করার পর অগ্নির তাপে তার মস্তিষ্ক শুষ্ক বোধ হওয়াতে লোকটি মাথার তালুতে প্রচুর তেল ঢালল। তারপর কোন কার্যে চুল্লী থেকে নীচে নামবার জন্য উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ তার মাথা ছাদের একটি কীলকে লেগে গেল এবং রক্ত পড়তে লাগল। যন্ত্রণায় সে মাথা নীচু করলে তেল মিশ্রিত কয়েক ফোঁটা রক্ত তালু থেকে গড়িয়ে চুল্লীর উপর রক্ষিত কড়াইয়ে গিয়ে পড়ল। ঔষধ মিশ্রণ শেষ হলে তা পরীক্ষা করার জন্য সে আর তার স্ত্রী ঔষধটি গায়ে মাখতেই তারা শূন্যে উঠে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য এ সংবাদ পেয়ে স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মাঠে তা'দিকে দেখতে এলেন। উপর থেকে লোকটি তখন চিৎকার করে রাজাকে বললে, "আমার নিষ্ঠিবন গ্রহণ করার জন্য মুখ খোল।" ঘৃণায় রাজা তা করতে চাইলেন না। লোকটির নিষ্ঠিবন তখন একটি গৃহদ্বারের নিকটে পড়ল। তৎক্ষণাৎ দ্বারের চৌকাঠ সোনায় পরিণত হয়ে গেল। 'ব্যাদি' তারপর তার স্ত্রীর সঙ্গে যদৃচ্ছা উড়ে বেড়াতে লাগল। লোকটি রসায়ন শাস্ত্রে কয়েকটি সুবিখ্যাত পুস্তকও রচনা করেছে। লোকে বলে, ওরা দুজন এখন পর্যন্ত জীবিত আছে।

এই ধরণের আরেকটি গল্প এই। মালয়ের রাজধানী 'ধার' নগরের—যেখানে এখন রাজা ভোজ রাজত্ব করছেন,—শাসন গৃহের দ্বারে রূপার একটি চতুষ্কোণ খণ্ড পড়ে আছে, যাতে মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গের আকার স্পষ্ট বোঝা যায়। আসল ব্যাপার সম্বন্ধে বলা হয় যে পুরাকালে ওদের এক রাজার কাছে একটি লোক রসায়নের একটা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এসেছিল, যার ব্যবহারে রাজা অমর ও অজেয় হবে এবং ইচ্ছাপূরণ করবার ক্ষমতা লাভ করবে। রাজা নির্জনে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে। তার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করার আদেশ দিল। লোকটি তখন কয়েকদিন ধরে আগুনে তেল ফুটাতে থাকল। এইভাবে তেল যখন এক বিশেষ ঘনত্বে পৌঁছ্‌ল তখন লোকটি রাজাকে বললে, "এই তেলের মধ্যে ঝাঁপ দাও, তাহলে তোমার জন্য এই প্রক্রিয়াটি শেষ করতে পারি।" ফুটন্ত তেল দেখে রাজা ভীত হোল, তাতে ঝাঁপ দেবার সাহস হোল না। রাজার ভীরুতা দেখে লোকটি বল্‌লে, "তোমার যখন সাহস হচ্ছে না, আর তুমি নিজের জন্য এর ফল চাও না, তখন আমি নিজে সে কাজ করতে চাই; তাতে তোমার অনুমতি পাব কি?" রাজা বল্‌লে, "তোমার যা খুশী তা-ই কর।" লোকটি তখন ঔষধের কয়েকটি মোড়ক বার করে রাজার হাতে দিয়ে কতকগুলি লক্ষণ বুঝিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিলে যে, একটির

পর একটি লক্ষণ দেখা দিলে মোড়কের নির্দিষ্ট ঔষধগুলি পর পর যেন ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হয়। লোকটি তখন ফুটন্ত তেলে প্রবেশ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ গলে গিয়ে নরম মণ্ডে পরিণত হোল। রাজা তখন নির্দেশ মত লক্ষণ দেখে দেখে ঔষধ নিক্ষেপ করতে লাগল, কিন্তু যখন মাত্র আর একটি মোড়কের ঔষধ বাকী তখন রাজা ভাবল, "এই লোকটি যদি সত্যই অমর, সর্বজয়ী ও অজেয় হয়ে পুনরুত্থিত হয়, তাহলে তার রাজ্যের কি হবে?" এই সম্ভাবনার কথা তার মনে উদয় হওয়াতে রাজা শেষ ঔষধটি আর নিক্ষেপ করল না। পরে কড়াইটি শীতল হলে দেখা গেল, লোকটি তার মধ্যে উপরোক্ত রোপ্যখণ্ডের ভিতর বসে আছে।

বালভির রাজা 'বল্লভ' সম্বন্ধে ওরা আর একটি গল্প বলে থাকে। বল্লভের সন তারিখ আমি যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

'তুহর' (? থুহর — تُوهَر) বলে যে এক প্রকার আঠাযুক্ত লতা আছে, যা ভাঙলে দুধের মত রস নির্গত হয়, তার সম্বন্ধে 'সিদ্ধার' স্তর প্রাপ্ত এক ব্যক্তি এক রাখালকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এমন কোনও 'তুহর' লতা সে দেখেছে কিনা, যা ভাঙলে দুধের পরিবর্তে রক্ত বাহির হয়। রাখালটি বল্‌লে, "হ্যা"। সিদ্ধা তখন তাকে পান করার জন্য কয়েকটি পয়সা দিয়ে লতাটি দেখিয়ে দিতে বল্‌লে। রাখাল লতাটি দেখিয়ে দিলে, লোকটি তাতে আগুন ধরিয়ে রাখালের কুকুরটিকে সে আগুনে নিক্ষেপ করল। রাখাল তাতে ক্রুদ্ধ হ'য়ে সিদ্ধাকে কুকুরের মতই আগুনে নিক্ষেপ করল। আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রাখাল দেখল যে কুকুর এবং সেই লোকটি উভয়ের দেহই সোনায় রূপান্তরিত হয়ে ভস্মের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সে কুকুরের স্বর্ণদেহ নিয়ে লোকটির দেহকে সেখানেই ফেলে রেখে চলে এলো। পরে একজন কৃষক সেই স্বর্ণদেহ দেখতে পেয়ে তার একটি আঙ্গুল কেটে এক সব্জিবিক্রেতার কাছে নিয়ে গেল। সব্জিবিক্রেতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। সেইজন্য তাকে 'রঙ্গক' অর্থাৎ দরিদ্র বলা হোত। স্বর্ণ-অঙ্গুলির বিনিময়ে কৃষক তার আবশ্যকমত সব্জি কিনে নিয়ে আবার সেই স্বর্ণদেহের কাছে গিয়ে দেখল, যে যেখান থেকে আঙ্গুল কেটে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে পুনরায় তেমনি আর একটি আঙ্গুল গজিয়েছে। সে আঙ্গুলটিকেও সে কেটে নিয়ে আবার সব্জিবিক্রেতার কাছে গিয়ে আবশ্যকমত দ্রব্যাদি কিনল। সব্জিবিক্রেতা তখন তার কাছে স্বর্ণাঙ্গুলের রহস্য জানতে চাইলে কৃষকটি নির্বোধের মত সত্য ঘটনা বলে দিল। 'রঙ্গক' তখন সেই স্থানে গিয়ে সিদ্ধার স্বর্ণদেহটি শকটে করে নিজ গৃহে নিয়ে এলো। সে সেখানেই বাস করতে লাগল।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে এত ধনবান হোল যে সমস্ত নগরটি সে কিনে নিলে। রাজা বল্লভ অর্থের বিনিময়ে এই নগরটি ক্রয় করতে চাইলে লোকটি সম্মত হোল না। কিন্তু পরে রাজরোষের আশঙ্কা করে 'আলমানসুরার' অধিপতির শরণাপন্ন হোল, এবং অর্থ ও উপঢৌকন দিয়ে নৌবাহিনীর সাহায্য প্রার্থনা করল। আলমানসুরার অধিপতি তার অনুরোধক্রমে তাকে সাহায্য করল এবং রাত্রিতে অতর্কিত আক্রমণ করে রাজা বল্লভের লোকজন সহ তাকে হত্যা করল। লোকে বলে যে, এখন পর্যন্ত বল্লভ নগরে এই আকস্মিক নৈশ আক্রমণের ফলে নগর ধ্বংস হওয়ার চিহ্ন বর্তমান আছে।

নির্বোধ হিন্দু রাজাদের স্বর্ণ তৈরী করার লোভ এত বেশী যে, সে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে কেউ যদি রাজাকে অনেকগুলি শিশু হত্যা করার পরামর্শ দেয়, তাহলে সেরূপ নৃশংস কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না, এবং তা'দিকে আগুনে নিক্ষেপ করতেও তার বাধবে না। এই মহামূল্য 'রসায়ন' বিদ্যাটিকে যদি পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করা হোত, যেখান থেকে কেউ তা সংগ্রহ করতে পারত না, তাহলে সব দিক দিয়ে মঙ্গল হোত।

ইরাণের কিংবদন্তী অনুসারে মৃত্যুকালে Isfandiad বলেছিল, "কাউস্‌কে শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত শক্তি ও দিব্যবস্তুসমূহ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে জরাগ্রস্ত ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ অবস্থায় সে 'ক্বাফ্' পর্বতে গেল। কিন্তু সেখান থেকে প্রফুল্ল, সুঠাম ও সবল দেহ হয়ে আল্লার আদেশ মত মেঘে আরোহণ করে সে ফিরে এলো।"

মাছুলি ও মন্ত্র (সামুদ্রিক) তন্ত্রে হিন্দুদের গভীর বিশ্বাস। এ সবে জন-সাধারণের খুব আসক্তি আছে। এই বিষয়ে যে গ্রন্থ আছে সেটি নারায়ণের বাহন 'গরুড়ের' নিকট থেকে পাওয়া বলে এদের বিশ্বাস। অনেকে 'গরুড়ের' যে বর্ণনা দেয় তা sifrid পক্ষীর গুণ ও আচরণের সঙ্গে মেলে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, পক্ষীটি মাছের শত্রু ও শিকারী। পশুপক্ষীর স্বভাবের এক বিশেষত্ব হচ্ছে, তাদের বিপরীত প্রকৃতির প্রাণীর প্রতি তাদের আক্রোশ এবং তা'দিকে শত্রুভাবে এড়িয়ে চলা। বর্ণনামতে পক্ষীটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, জলের উপর দিয়ে যখন সে ধীরে ধীরে উড়তে থাকে এবং কখনও কখনও জলের উপর ভাসতে থাকে, মাছগুলি তখন নিচে থেকে জলের উপরে ভেসে উঠে। তার দরুণ মাছ ধরা তার পক্ষে সহজ হয়, যেন মাছগুলিকে সে মন্ত্রে বশীভূত করেছে। অন্যেরা আবার গরুড়ের যে বর্ণনা দেয় তার থেকে মনে হয় পক্ষীটি বক জাতীয়। বায়ুপুরাণে তাকে হলুদবর্ণ

বলা হয়েছে। মনে হয় গরুড় পক্ষী sifrid-এর চেয়ে বকেরই বেশী নিকটতর। কেননা বকও গরুড়ের ন্যায় সর্পহন্তা।

এদের মন্ত্র তন্ত্রের বেশীর ভাগই সর্পদষ্ট লোকের জন্য ব্যবহার করা হয়। সর্পদংশনে মন্ত্রতন্ত্রের ওপর এদের বিশ্বাসের আতিশয্যে অবাক হতে হয়। একজনের কাছে শুনেছি যে, সে একটি লোককে দেখেছিল, যার সর্পদংশনে মৃত্যু হবার পর মন্ত্রবলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল এবং বেঁচে থেকে অন্য লোকের মত সমানভাবে চলাফেরা করত। আরেকজনকে বলতে শুনেছি যে, সে একজন সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে মন্ত্রবলে উঠে বসে কথা বলতে এবং অন্তিম নির্দেশ (will) দিয়ে তার গচ্ছিত ধনের বিবরণ ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি দিতে দেখেছিল। কিন্তু পক্ক অন্নের ঘ্রাণ তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই প্রাণহীন হয়ে সে পড়ে গেল, এবং তার দেহে জীবনের আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

হিন্দুদের রীতি যে কাউকে সর্পাদি দংশন করলে এবং ওঝা উপস্থিত না থাকলে দষ্ট ব্যক্তিকে সোলা বা নলের গুচ্ছের সঙ্গে বেঁধে, তার উপরে একটি পত্রে তার জন্যে আশীর্বাদ লিখে রাখে যেন, মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে মন্ত্রের দ্বারা তাকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে।

এ বিষয়ে আমি কী বলতে পারি জানি না, কারণ এ সবে আমার মোটেই বিশ্বাস নাই। তুক্‌তাক বা কারসাজিতে যার বিশ্বাস নাই, এমন কি বাস্তব ঘটনা ও যে অবিশ্বাস করে, এমন একজন সন্দিগ্ধমনা লোক আমাকে বলেছিল, যে একবার তার দেহে বিষের ক্রিয়া হয়েছিল, সেজন্য লোকে তার কাছে কয়েকজন মন্ত্রজ্ঞ হিন্দুকে পাঠিয়েছিল। তারা তার কাছে এসে সুর করে তাদের মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। তাতে তার অস্থিরতা কিঞ্চিত লাঘব হল। হিন্দুলোকগুলি তাদের হাত আর যষ্টি দিয়ে ক্রমাগত নানা রকম সঙ্কেত করতে থাকল এবং লোকটিও ক্রমে ক্রমে সুস্থবোধ করতে লাগল।

আমি নিজে দেখেছি যে হরিণ শিকার করার সময় হিন্দুরা পশুটিকে হাত দিয়ে ধরে ফেলে। একজন এমনও দাবী করল যে গাত্র স্পর্শ না করে সে হরিণকে তাড়না করে সোজা রন্ধনশালায় নিয়ে আসতে পারে। কিসের জোরে এরূপ দাবী করা হয়, আমি অবশ্য বুঝি। নিরন্তর একই প্রকারের ধ্বনি শুনিয়ে পশুটিকে ক্রমশঃ অভ্যস্ত করা ছাড়া আর কোন চাতুরি এতে নাই। আমাদের লোকেরাও পাহাড়ি ছাগশিকারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই পশুগুলি হরিণের চেয়ে

অনেক বেশী বন্য। পশুগুলি বসে আছে দেখতে পেয়ে শিকারীরা তাদের চতুর্দিকে একই স্বরে গান করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ না পশুগুলি সে স্বরকে স্বাভাবিক শব্দ ভেবে তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন শিকারীরা তাদের বৃত্তকে ক্রমান্বয়ে ছোট করে আনতে থাকে—যেখান থেকে নিশ্চিতভাবে পশুগুলিকে শরবিদ্ধ করা যায়। 'কাতা' (قطا - kata) পক্ষী শিকারীরাও রাত্রিকালে একই তালে তামার পাত্র বাজাতে থাকে এবং অবশেষে হাত দিয়ে পক্ষীগুলিকে ধরে ফেলে। তালের এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই কিন্তু পক্ষীরা সব উড়ে পালায়।

এসব অবশ্য বিশেষ প্রক্রিয়া ; এতে মন্ত্রতন্ত্রের কোনও হাত নাই। প্রোথিত বাঁশ ও শক্ত করে বাঁধা দড়ির উপর খেলা দেখাতে পারে বলে, ওদের ক্ষিপ্রতার জন্য কখনও কখনও হিন্দুদের যাদুগীর মনে করা হয়। কিন্তু ক্রীড়ানৈপুণ্য সব জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়।

॥ দুই ॥

[ভারতীয় বর্ণমালা ও সংখ্যা চিহ্ন]

জিহ্বা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়। জিহ্বায় এ কাজের স্থিতি কিন্তু সাময়িক। মুখে মুখে অতীতের কাহিনী পরবর্তী যুগের লোকের কাছে পৌঁছান সম্ভব নয়, বিশেষ করে যদি এই দুই কালের মধ্যবর্তী ব্যবধান দীর্ঘ হয়। মানুষের উদ্ভাবিত লিখন পদ্ধতির সাহায্য ব্যতিরেকে তা কখনই সম্ভব নয়। এই পদ্ধতি দেশে দেশে ও কালে কালে বায়ুবেগে মৃত আত্মার ব্যাপ্তির মত, সংবাদ প্রচার করে। সমস্ত প্রশংসা সেই স্রষ্টার ও মঙ্গলময় সর্বনিয়ন্তার।

হিন্দুরা প্রাচীন গ্রীকদের মত চামড়ায় লিখতে অভ্যস্ত নয়। তিনি কেন পুস্তক লেখেন না জিজ্ঞাসিত হলে Socrates উত্তর দিয়েছিলেন, "মানুষের জীবন্ত মন থেকে জ্ঞানকে মৃত পশুর চর্মে স্থানান্তরিত করার আমি পক্ষপাতী নই।" ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরাও চামড়ায় লিখত, যেমন, খায়বরের ইহুদিদের সাথে হজরতের সন্ধি, কিংবা পারস্যের সম্রাটকে লিখিত তাঁর পত্র। কোরাণও সেকালে হরিণের চামড়ায় লেখা হ'ত। এখনও এই চামড়ায় লেখা হয়।

কোরাণে আছে ঃ—"ওরা তাকে 'ক্‌রাতিসে' পরিণত করল"—অর্থাৎ কাগজের স্তূপে পরিণত করল। "ক্‌রাতিস্‌" কির্‌তাস্‌ শব্দের বহুবচন। কির্‌তাস্‌ মিশর দেশের papyrus নামক উদ্ভিদের ভিতরের শাঁস ফেলে দিয়ে তার বাইরের ছাল থেকে তৈরী হয়। আমাদের যুগ পর্যন্ত খলিফাদের ঘোষণা ও নির্দেশাদি এই কির্‌তাসে লিখিত হয়েই জারি হত। কারণ papyrus-এ লিখিত অক্ষর বদলান বা মুছে ফেলা যায় না; তা করলে papyrus নষ্ট হয়ে যায়। কাগজ চীনাদের আবিষ্কার। কয়েকজন চীনা বন্দী Samarkand-এ প্রথম কাগজ তৈরী করা আরম্ভ করে; পরে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনমত কাগজ তৈরী হতে থাকে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে খর্জুর ও নারিকেলের মত খাদ্যোপযোগী ফলবান এক প্রকার গাছ হয়, যার পাতা প্রায় একগজ দীর্ঘ ও তিন অঙ্গুলি পরিমাণ প্রশস্ত। এই পাতাকে ওরা 'তারি' (toddy) বলে ও তাতেই ওরা লেখে। এই 'তারিতে' লেখা পুস্তকের মধ্যে ছিদ্র করে তাতে সূতা পরিয়ে ওরা পত্রগুলির পারম্পর্য রক্ষা করার জন্য বেঁধে রাখে। মধ্য ও উত্তর ভারতের লোকেরা 'তুয' (توز) নামক একরকম গাছের ছাল ব্যবহার করে। এই ছালকে ওরা 'ভুচ্‌' (ভূর্জ) বলে। দুই হাত দীর্ঘ ও প্রায় এক বিঘৎ পরিমাণ চওড়া ছাল্‌কে ওরা তেল দিয়ে ঘষে দৃঢ় ও মসৃণ করে, তারপর তাতে লেখে। পাতাগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে বলে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে তাদের পারম্পর্য ঠিক রাখা হয়। সমস্ত পুস্তকটিকে তারপরে বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে দুইটি কাষ্ঠফলকের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়। এই প্রকারের পুস্তককে ওরা 'পুঁথি' বলে। চিঠিপত্র বা অন্য যা কিছু লেখার প্রয়োজন হয় সবই ওরা এই tuz এর ছালে লেখে।

ওদের বর্ণমালা সম্বন্ধে পূর্বে আমি বলেছি, যে একবার এইগুলি হারিয়ে যাওয়াতে লোকে সমস্ত ভুলে গিয়েছিল এবং কেউ স্মরণ করার চেষ্টাও করেনি। তার ফলে সবাই নিরক্ষর হয়ে থাকে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংস্পর্শ না থাকাতে তাদের মূর্খতা বেড়েই চলে। তখন পরাশর-পুত্র ব্যাস্‌ ঈশ্বর প্রেরণায় পঞ্চাশ অক্ষরের একটি বর্ণমালা উদ্ভাবন করলেন। ওদের ভাষায় বর্ণের নাম 'অক্ষর'।

কেউ কেউ বলে, প্রথমে ওদের বর্ণের সংখ্যা অল্প ছিল, পরে বেড়েছে। তা হওয়া সম্ভব, বরঞ্চ উচিত, কেননা ইসরাইল বংশীয়রা যখন মিশরে রাজত্ব করছিল, Asidas (اسيدس) নামক একটি লোক বিজ্ঞানের তথ্যকে স্থায়িরূপ দেবার জন্য ১৬ অক্ষরের একটি লিপিমালা উদ্ভাবন করে, পরে Kimush (قيموش)

ও Agenon (اغنون) সেই বর্ণমালাটি ইউনানীদের কাছে নিয়ে আসে। ইউনানীরা তাতে আরও চারটি বর্ণ জুড়ে ২০ অক্ষরের বর্ণমালা তৈরী করে। আরও কিছুকাল পরে, Socratesকে বিষপান করাবার প্রায় কাছাকাছি সময়ে, Simonidas তাতে আরও চারটি অক্ষর বাড়ায়। এইভাবে এথেনীয়দের ২৪ অক্ষরের বর্ণমালাটি সম্পূর্ণ হয়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে Cyrus-এর প্রপৌত্র Artaxernes এর রাজ্যকালে এথেনীয় বর্ণমালার এই সম্পূর্ণতা সাধিত হয়।

হিন্দুদের অক্ষরের সংখ্যা অনেক। তার কারণ, স্বর, হস্, বিসর্গ বা হ্রস্ব স্বর প্রকাশ করার জন্য ওরা ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর ব্যবহার করে থাকে। আরও একটি কারণ এই যে, ওদের এমন সব ব্যঞ্জন বর্ণ আছে যার যুক্ত ধ্বনিরূপ আর কোন ভাষায় পাওয়া যায় না, যদিও অন্যান্য ভাষায় বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলি পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলি আবার এমন যে, অনভ্যাসের দরুণ আমাদের জিহ্বা সেগুলিকে ক্বচিৎ উচ্চারণ করতে পারে এবং আমাদের কানও সমজাতীয় এইরূপ দুটি বর্ণের পার্থক্য ধরতে পারে না। ইউনানীদের মত ভারতীয়রাও বাম থেকে দক্ষিণে লেখে। আরবীর মত ওরা রেখার অনুসরণ করে লেখে না। আরবী লিপিতে যেমন এক কাল্পনিক রেখার অনুসরণ করা হয়, অক্ষরের ঊর্ধ্বভাগ যার উপরে আর নিম্নভাগ যার নীচে থাকে, হিন্দুরা তেমন কোন রেখার অনুসরণ করে না। ওদের রীতিভিন্ন। মূল রেখাটি উপরে সরলভাবে টানা থাকে ; এই রেখা থেকে অক্ষরগুলি নীচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় লিখিত হয়। রেখার উপরে যদি কোন চিহ্ন দেওয়া হয় ত' সে চিহ্ন অক্ষরটির ব্যাকরণিক উচ্চারণ নির্দিষ্ট করার জন্য মাত্র।

ওদের সবচেয়ে প্রচলিত বর্ণমালার নাম হচ্ছে 'সিদ্ধ মাত্রিক'। একে সচরাচর 'কাশ্মীরী' বলা হয়। অবশ্য বারাণসীতেও এর প্রচলন আছে। বারাণসী ও কাশ্মীর হিন্দু জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিশেষ। 'সিদ্ধ মাত্রিক' বর্ণমালা মধ্যদেশেও ব্যবহার হয়। মধ্যদেশ কনৌজের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যার আর এক নাম আর্যাবর্ত। মালব অঞ্চলে 'নাগর' নামে আর এক বর্ণমালা আছে। প্রথমোক্ত বর্ণমালার সাথে এর প্রভেদ কেবল আকৃতিগত। তারপর 'অর্ধ নাগরী' লিপির উল্লেখ করতে হয়। 'সিদ্ধমাত্রিক' 'নাগরের' মিশ্রণ বলে একে 'অর্ধ-নাগরী' বলা হয়। 'ভাটিয়া' ও 'সিন্ধুর' কয়েকটি অঞ্চলে এর ব্যবহার প্রচলিত আছে।

অন্যান্য লিপিমালার মধ্যে দক্ষিণ-সিন্ধুর সমুদ্রোপকূলবর্তী 'মালকাসাও'-এ (ملقشو) প্রচলিত 'মালক্কারী' (Malwari ?), বাহ্‌মান্‌ওয়া (Bahranabad)

কিংবা আল্‌মান্‌সুরার সৈন্ধব, কর্ণাট দেশের—যেখান থেকে 'কন্নাড়া' নামক সৈন্যেরা আসে—'কর্ণাট লিপি', 'অন্তর দেশের' (অন্ধ্র দেশ ?) অণ্ড্রি (? অন্ধ্রি), দিরওয়ার দেশে ব্যবহৃত 'দিরওয়ারি' (?), 'লাত' (লাট) দেশের 'লারি' (লাটি), 'পূর্ব দেশে' প্রচলিত 'গৌড়ি' ও 'উদনপুরে' (উদ্দণ্ডপুর) প্রচলিত 'বৈক্‌সুক্‌' (? Baikshuki) প্রভৃতির নাম করা যায়। শেষোক্ত লিপিটি বৌদ্ধদের।

আমরা যেমন 'বিস্‌মিল্লাহ' দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করি, তেমনি হিন্দুদের গ্রন্থ সূচনা হয় 'ওম্‌' অর্থাৎ সৃষ্টি-ধ্বনি দিয়ে। 'ওমের' রূপ এই 'ওঁ'। এটি কোন অক্ষর নয়, 'ওম' শব্দের নির্দিষ্ট সঙ্কেত মাত্র, নির্গুণতার পুণ্যাত্মক স্মারকচিহ্ন। ইহুদিরা যেমন তাদের গ্রন্থ সূচনায় আল্লাহ্‌র নাম তিনটি হিব্রু 'ה' দিয়ে লেখে, এ-ও তেমনি। Torahতে আক্ষরিকভাবে চিহ্নটি লেখা হয় 'YHVH' (יהוה) কিন্তু উচ্চারণ করা হয় Adonai, কখনও বা শুধু 'YH' (יה) পড়া হয়। যে Adonai শব্দ ওরা উচ্চারণ করে, লিপিতে তা লেখা হয় না।

আমরা যেমন সংখ্যা লিখতে হিব্রু বর্ণমালার বিন্যাস অনুযায়ী আরবী অক্ষর ব্যবহার করে থাকি, হিন্দুরা তেমন করে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বিভিন্ন আকৃতির অক্ষর প্রচলিত আছে, তেমনই অঙ্ক নামিত সংখ্যাচিহ্নগুলিও বিভিন্ন প্রকারের আছে। আমরা যে সংখ্যাচিহ্নগুলি ব্যবহার করে থাকি তা হিন্দুদের শ্রেষ্ঠতম চিহ্ন থেকে গৃহীত। কিন্তু চিহ্নের অর্থ না জানা থাকলে তার ব্যবহারে কোন লাভ নাই। কাশ্মীরের লোকেরা তাদের পুস্তকের পত্রসংখ্যা এক রকম চিহ্নে নির্দেশ করে, যা ছবি কিংবা চীনা অক্ষরের মত দেখতে। অভ্যাস ও চর্চা না করলে তার অর্থ বোঝা যায় না। এরূপ চিহ্ন কিন্তু বালুর উপরে গণনা করার জন্য ব্যবহার করা যায় না।

সমস্ত মানব জাতিই এ বিষয়ে একমত যে, অঙ্ক শাস্ত্রে দশক সংখ্যাগুলির ক্রমবিন্যাস ১০এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি), অর্থাৎ প্রত্যেকটি দশক তার পরবর্তী দশকের দশ ভাগের এক ভাগ, আর পূর্ববর্তীর দশগুণ। বিভিন্ন ভাষাভাষী যে সব লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, তাদের সঙ্গে সংখ্যাবিন্যাস আলোচনা করে জেনেছি যে, আরবদের মত সহস্রের ঊর্ধ্বে কেউই যায় না। এই নিয়মটিই সবচেয়ে ঠিক ও স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি।

হিন্দুদের কিন্তু সহস্রোর্ধ্ব সংখ্যাগুলির পৃথক নাম আছে। সে নামের কতকগুলি হয় স্বতন্ত্র শব্দরূপে উদ্ভাবিত, নয়তো ব্যাকরণ-রীতিতে গঠিত, আর কতকগুলি

এই দুই রীতির সংমিশ্রণে স্থিরীকৃত। অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োজনে ওরা সংখ্যার দশক বিন্যাসকে আঠার পদ পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই কাজে বৈয়াকরণিকরা, গাণিতিককে শব্দ ও ধাতুরূপের নানা তথ্য ও প্রক্রিয়া দিয়ে সাহায্য করে।

অষ্টাদশ পদের নাম হচ্ছে পরার্ধ, অর্থাৎ আকাশের অর্ধেক। আরও নিখুঁত-ভাবে বলতে গেলে তার অর্থ হয়, ঊর্ধ্বে যা আছে তার অর্ধেক। তার ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয় যে, যেহেতু ওরা 'কল্পের' অংশ দিয়ে সময়ের ভাগ নির্ণয় করে, সেহেতু এক কল্পে ঈশ্বরের এক দিবস হয়। আকাশের উপরে আর কিছুই নাই, সেজন্যে তার চেয়ে বড় আর কোন আকারই হয় না। এই আকাশের অর্ধেক তাহলে দীর্ঘতম দিবসেরও অর্ধেক হবে। এই দিবসের সাথে রাত্রি যোগ করে, এই অর্ধেক আকাশকে দ্বিগুণ করলে তা দীর্ঘতম, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিবসের সমান হবে। এই যুক্তিতেই যে পরার্ধের অর্থ করা হয় তাতে সন্দেহ নাই। পরার্ধের শব্দগত অর্থও হচ্ছে সমগ্র আকাশ।

দশকের এই অষ্টাদশ পদের নামগুলি এই ঃ

১ একম্	১০ পদ্ম
২ দশম্	১১ খর্ব
৩ শতম্	১২ নিখর্ব
৪ সহস্রম	১৩ মহাপদ্ম
৫ অযুত	১৪ সংখ্য
৬ লক্ষ	১৫ সমুদ্র
৭ প্রযুত	১৬ মধ্য
৮ কোটি	১৭ অন্ত
৯ নর্বুদ	১৮ পরার্ধ

এই বিন্যাস নিয়ে মতভেদও আছে। কেউ কেউ বলেছে যে, পরার্ধের পরও 'ভূরী' নামে আর একটি উনিশতম পদ আছে এবং গণনার এইটিই হচ্ছে শেষ সীমা। কিন্তু আসলে গণনার তো আর শেষ নাই; কেবল সংখ্যা বিন্যাসের সীমা আছে, তাও কেবল ক্রমিকতার (order) সর্বস্বীকৃত সীমা। এখানে ব্যবহৃত 'গণনা' শব্দের দ্বারা ওরা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যার নাম বোঝাতে চায়, অর্থাৎ ওরা বলতে চায় যে উনিশটি পদের চেয়ে বেশী বিস্তৃত কোন সংখ্যার নাম করা যায় না। জানা আছে যে এই

ঊনবিংশতি পদ অর্থাৎ 'ভূরী' হচ্ছে দীর্ঘতম দিবসের এক পঞ্চমাংশের সমান। তবে সে বিষয়ে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য শ্রুতি নাই। যা আছে তা শুধু কল্পদিবসকে ভাগ করার নিয়ম সম্বন্ধে, যা আমি পরে বর্ণনা করছি। কাজেই, এই ঊনবিংশতি পদটি কষ্টকল্পিত যোজনা বই আর কিছু নয়। আবার অন্যদের মতে 'কোটি' হচ্ছে গণনার শেষ সীমা। "কোটি" থেকে আরম্ভ করলে দশকগুলির ক্রমবিন্যাস এরূপ হবে: সহস্র, শত ও দশ। এর কারণ, দেবতাদের সংখ্যা 'কোটি' দিয়ে করা হয়। ওরা বলে, দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি, ব্রহ্মা, নারায়ণ ও মহাদেব, তাঁদের প্রত্যেকের এগার কোটি করে দেবতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি, আট পদের ঊর্ধ্বে যে নামগুলি আছে তা সবই বৈয়াকরণিকদের উদ্ভাবিত। পঞ্চম ও সপ্তম পদের সাধারণ নাম দশ সহস্র ও দশ লক্ষ। 'অযুত' ও 'প্রযুত' ক্বচিৎ ব্যবহার করা হয়।

কুসুমপুরের আর্যভট্ট দশ সহস্র থেকে কোটি পর্যন্ত পদগুলির এই নাম দিয়েছেন: 'অযুতম', 'নিযুতম', 'প্রযুতম', 'কোটিপদ্ম', 'প্রপদ্মম্'। কেউ কেউ আবার নাম-সাদৃশ্যের জন্য পদকে পর পর বসায়; যেমন পঞ্চম পদের নাম 'অযুত' বলে ষষ্ঠ পদকে 'নিযুত' বলে, নবম পদ 'নির্বুদ' সেই জন্য অষ্টম 'অর্বুদ' একাদশ ও দ্বাদশ পদ 'খর্ব' ও 'নিখর্ব', এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পদ 'সংখ্য' ও 'মহাসংখ্যের' মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্যগত পারম্পর্য আছে। এই রীতি অনুযায়ী 'মহাপদ্ম' 'পদ্মের' পরই বসান উচিত।

এসব মতভেদের যুক্তি বোঝা যায়। কিন্তু যার মধ্যে কোন যুক্তি নাই, এমন অনেক মতানৈক্যও আছে, যা পারম্পর্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল নাম উল্লেখ করে যাওয়ার দরুণ, কিংবা' আমি জানি না' বলতে অনিচ্ছার দরুণ ঘটেছে। কোন বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করা ভারতীয়দের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন।

'পৌলিশ সিদ্ধান্ত' সংখ্যার পদবিন্যাসের এই তালিকা দিয়েছে:

৪ সহস্রম্	৮ কোটি
৫ অযুতম্	৯ অর্বুদম্
৬ নিযুতম্	১০ খর্ব,
৭ প্রযুতম্	

তারপর পদগুলির বিন্যাস পূর্বোক্ত পারম্পর্য অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে।

অঙ্কের চিহ্নগুলি (numerals) ওরা আমাদের মতই ব্যবহার করে। এ বিষয়ে ওরা আমাদের চেয়ে কতটা অগ্রবর্তী, তা দেখানোর জন্য আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে হিন্দুরা ওদের সমস্ত গ্রন্থই শ্লোকে রচনা করে। পঞ্জিকা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য ওরা যখন একাধিক পদের কোন সংখ্যা উল্লেখ করতে চায়, তখন এমন শব্দ বা বাক্য দিয়ে সে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করে যা দশক বা শতক উভয় পদের সংখ্যাতেই প্রযুজ্য হতে পারে। প্রত্যেক সংখ্যার জন্য ওরা অনেকগুলি শব্দ বা বাক্য স্থির করে নিয়েছে। তার মধ্যে একটি যদি ছন্দের উপযোগী না হয়, তাহলে অন্য একটি প্রতিশব্দ সহজেই সেখানে ব্যবহার করা চলে। ব্রহ্মগুপ্ত বলছেন ঃ "এক লিখতে হ'লে এমন শব্দ দিয়ে তা প্রকাশ কর যা একক, যেমন পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি। দুই সংখ্যা বোঝাতে হলে জোড়া বস্তুর উল্লেখ করে তা প্রকাশ কর, যেমন সাদাকালো। তিন লিখতে হলে তিন সংখ্যক বস্তুর নাম দিয়ে তা প্রকাশ কর। শূন্যকে আকাশ, আর ১২কে সূর্যের নাম দিয়ে প্রকাশ কর।"

এইরকম নাম যা ওদের কাছে শুনেছি, তার একটি তালিকা নীচে দিচ্ছি। ভারতীয়দের জ্যোতিষ পঞ্জিকাদি বুঝতে হলে সংখ্যাবাচক এই শব্দগুলি বোঝা অত্যাবশ্যক। প্রতিটি শব্দের অর্থ আমি জানি না। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সেগুলির অর্থ জানতে পারলে পরে লিখব।

শূন্য = O (Zero)

O ও খ—উভয় চিহ্নের অর্থ হচ্ছে বিন্দু।
গগন—আকাশ
বিয়াত— ,,
অম্বর— ,,
অভ্র— ,,
আকাশ
পুনর্বসু

এক = ১

আদি—সূচনাকারী
শশী—চন্দ্র
ইন্দু— ,,
সীতা—
উর্বর ধরণী—
পিতামহ—আদি পিতা
চন্দ্র—
সীতাংশু—
রূপা
রশ্মি

দুই=২

যম
অশ্বিন
লোচন--চক্ষুর্দ্বয়
অক্ষ
দস্র—(?)
যমল্‌
পক্ষ—মাসার্ধ
নেত্র—চক্ষুর্দ্বয়

তিন=৩

ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান
ত্রিজগৎ
ত্রয়ম্‌
পাবক, বৈশ্বানর, দহন, তপন, হুতাশন, জ্বলন, অগ্নি।
ত্রিগুণ—(সত্ত্ব-রজ—তম)
লোক—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল
ত্রিকূট

চার=৪

বেদ—চারি খণ্ডে বিভক্ত হিন্দুদের গ্রন্থ।
সমুদ্র—সাগর
অবধি
'দধি
দিক—চতুর্দিক
জলাশয়
কৃতা

পাঁচ=৫

শর
অর্থ
ইন্দ্রিয়—পঞ্চেন্দ্রিয়
শায়ক
এখুন (? ...)
বাণ
ভূত
ইশু (?)
পাণ্ডু—পঞ্চ পাণ্ডব
পত্রিন, মার্গন (?)

ছয়=৬

রস
অঙ্গ
ষট
"অলব্‌রম" (البرم)—বর্ষ
মাসার্ধম

সাত=৭

অগ (?
মহিধর
পর্বত
সপ্তম
নগ—পর্বত
অদ্রি
মুনি

আট=৮

বসু
ধী
গজ
দন্তিন্‌
অষ্ট
মঙ্গল
নাগ

নয়=৯

গো
নন্দ
রন্ধ্র
নবম—৯
ছিদ্র
পবন
অন্তর

দশ=১০

দিক
আশা
খেন্দূ— (?)
রাবণ শির

এগার=১১

রুদ্র—সৃষ্টি-ধ্বংসী মহাকাল
ঈশ্বর
মহাদেব—দেবরাজ
অক্ষৌহিণী—কুরুসৈন্য

বারো=১২

সূর্য—কেননা সূর্যের সংখ্যা ১২
অর্ক— সূর্য
ভানু— ,,
আদিত্য— ,,
মাস
সহস্রাংশু

তেরো=১৩

বিশ্ব

চৌদ্দ=১৪

মনু—চৌদ্দ মন্বন্তরের আদি পুরুষগণ

পনের=১৫

তিথি—প্রতি মাসার্ধের চান্দ্র দিবস

ষোল=১৬

অষ্টি
নৃপ
ভূপ

সতের=১৭

অত্যি
অষ্টী (অত্যষ্টী ?)

আঠার-১৮

ধৃতি

উনিশ=১৯

অতিধৃতি

কুড়ি=২০

নখ
কৃতি

একুশ=২১

উৎকৃতি

বাইশ=২২

তেইশ=২৩

চব্বিশ=২৪

পঁচিশ=২৫

তত্ত্ব—যে ২৫টি তত্ত্বের জ্ঞান হলে মোক্ষ লাভ হয়।

যতদূর আমি দেখেছি ও শুনেছি, শব্দ দিয়ে সংখ্যার প্রতীক রচনায় ওরা ২৫ এর ঊর্ধ্বে যায় না।

হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত আবূ রায়হান আলবেরুণীর 'তাহ্‌কিক্ মা'লীক হিন্দ্' নামক আরবী গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের অংশ বিশেষের অনুবাদ।